স্বদেশ ও বিশ্বচেতনা, রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়

বর্তমান অস্থির এবং দিকভ্রষ্ট সময়ের মাঝে দাঁড়িয়ে, স্বদেশ ও বিশ্বচেতনার একটি সামগ্রীক উপলব্ধি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। এই কথা মনে রেখে, বর্তমান উপস্থাপনায় আমরা এরই একটি স্বরূপ নির্ধারণ করতে চেয়েছি রবীন্দ্রনাথের ভাবনা অবলম্বন করে। রবীন্দ্র জীবনেও স্বদেশ ও বিশ্বচেতনার উপলব্ধি একটি ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস যা তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে অঙ্গাগীক ভাবে জড়িত এবং আশ্চর্যজনক ভাবে যা আজকের প্রেক্ষাপটের নিরিখে সমান প্রাসঙ্গিক। এই উপস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনকালের বিভিন্ন উপন্যাস ও নাটকের অংশবিশেষ ব্যবহার করা হয়েছে তাঁর স্বদেশ ও বিশ্বচেতনার স্বরূপটি উদ্ঘাটন করার জন্য, সঙ্গে রয়েছে তাঁরই রচিত কিছু গান ও কবিতা, ভাবসমন্বয়ের সূত্র ধরে।

কবিতা - ছোটদের মধ্যে থেকে কেউ

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন - ' পরি ,
গান ব্যাসঋষি বীণা হাতে করি —
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন ,
কাঁপায়ে নীহারশীতল বায় ।

তখন পূর্ণিমা বিতরিত সুখ ,
মধুর উষার হাস্য দিত সুখ ,
প্রকৃতির শোভা সুখ বিতরিত
পাখির কূজন লাগিত ভালো ।

এখন তা নয় , এখন তা নয় ,
এখন গেছে সে সুখের সময় ।
বিষাদ আঁধার ঘেরেছে এখন ,
হাসি খুশি আর লাগে না ভালো ।

পর্দা ওঠে (দু দিকের সামনের কোনে সঞ্চালক এবং সেতারের ওপর আলো) - (ছবি ১)

সঞ্চালক - ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস। স্বাদেশিক হিন্দুমেলা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে একটি চৌদ্দ বছরের বালক তার জীবনের প্রথম প্রকাশিত কবিতাটি পড়েছিল। কবিতার নাম হিন্দুমেলার উপহার এবং কবির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | নিতান্ত কিশোরবয়স্ক বালকের এইরকম উচ্ছাসের পিছনে আরও একটি পটভূমিকা ছিল। - রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি রচনা থেকে -

(ছবি ২)

"জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল। বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বদেশিদের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়া বাড়িতে সেই সভা বসিত। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋকমন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি, ইহাতেই সকলের রোমহর্ষন হইত, আর বেশি কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহই আমরা যেন উৎসাহে উড়িয়া চলিতাম। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ ছিল উত্তেজনার আগুন পোহানো।"

জীবনের সূচনায় এই যে দু ধরনের স্বদেশচর্চা রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তা তাঁর মনে চিরস্থায়ী প্রভাব রেখে গিয়েছিল।

সঙ্গীত — সমবেত | সমবেত নৃত্য (ছোটদের) (নাচের আলো শুধু নীল আর হলুদ)

(ছবি ৩) মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গান কর' মহোজ্জ্বল আজ হে
বর -পুত্রসঙ্ঘ বিরাজ' হে ।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ' হে ।
ঘন তিমিররাত্রির চির প্রতীক্ষা,
পূর্ণ কর', লহ' জ্যোতিদীক্ষা,
যাত্রীদল সব সাজ' হে ।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ' হে ।
বল জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বীরাজ হে ।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় হে ॥

(ছবি ৪) এস' বজ্রমহাসনে মাতৃ-আশীর্ভাষণে,
সকল সাধক এস' হে, ধন্য কর এ দেশ হে ।

-

সকল যোগী, সকল ত্যাগী, এস' দুঃখসহদুঃখভাগী-
এস' দুর্জয়শক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে ।
এস' জ্ঞানী, এস' কর্মী, নাশ' ভারতলাজ হে ।
এস' মঙ্গল, এস' গৌরব,
এস' অক্ষয়পুণ্যসৌরভ,
এস' তেজঃসূর্য উজ্জ্বল কীর্তি-অম্বর-মাঝ হে ।
বীরধর্মে পুণ্যকর্মে বিশ্বহৃদয়ে রাজ' হে ।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ' হে ।
জয় জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বীরাজ হে ।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় হে ॥

(ছবি ৫) (দু দিকের সামনের কোনে সঞ্চালক এবং সেতারের ওপর আলো) সঞ্চালক - দশ বারো বছর পার হল। ইতিমধ্যে দেশে স্বদেশচর্চারও নানা চেষ্টা শুরু হয়েছে। সেকালের সেই বক্তৃতাকেন্দ্রিক আবেদন নিবেদন নির্ভর রাজনীতি রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন না। অত্যাচারী শাসক এবং কাপুরুষ দেশবাসী দুইয়ের প্রতিই তাঁর মনে যথেষ্ট তিক্ততা ছিল।

সঙ্গীত — 1 | 2 | নৃত্য (নাচের আলো শুধু ১-নীল ২-হলুদ)

(ছবি ৬)

সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়, আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়।

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি ।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই ?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব পশ্চাতে-জন-?
লউক বিশ্বকর্মভার মিলি সবার সাথে ।
প্রেরণ কর' ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে, জাগ্রত ভগবান হে ॥

দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়, নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।

বিঘ্নবিপদ দুঃখদহন তুচ্ছ করিল যারা
মৃত্যুগহন পার হইল, টুটিল মোহকারা ।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই ?
নিশ্চল নির্বীর্যবাহু কর্মকীর্তিহীনে
ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীনে
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে, জাগ্রত ভগবান হে ॥

(ছবি ৭)

ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে, নম্র হয়ে, পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়, দুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয়॥

নূতনযুগসূর্য উঠিল, ছুটিল তিমিররাত্রি,
তব মন্দিরঅঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী ।-
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই ?
গতগৌরব, হৃতআসন-, নতমস্তক লাজে—
গ্লানি তার মোচন কর' নরসমাজমাঝে ।
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে, জাগ্রত ভগবান হে ॥

মঞ্চ অন্ধকার (ছবি ৮) (দু দিকের সামনের কোনে সঞ্চালক এবং সেতারের ওপর আলো)

সঞ্চালক - স্বদেশ — পল্লীগ্রাম।।

রবীন্দ্রনাথের যখন বছর ত্রিশ বয়স তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে একটি গুরুতর বৈষয়িক কাজের ভার দেন। তা হল পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে ছড়ানো তাঁদের এজমালি জমিদারি দেখাশোনার ভার। এ ঘটনা রবীন্দ্রজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির একটি। তার প্রভাবে তাঁর সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সোনার ফসল ফলেছিল তার কথা সুবিদিত। আর তারই সঙ্গে, দেশের প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে তাঁর এক প্রগাঢ় উপলব্ধি ঘটেছিল। -- রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের নায়ক গোরা হিন্দু জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ এক তরুণ সৈনিক

(ছবি ৯) মঞ্চে পুরোনো হাতল ওয়ালা চেয়ার, ছোটো গোল টি টেবিল মাঝখানে, একটা তক্তোপোস ধুষর চাদরে ঢাকা | তক্তোপোসে কিছু পুরোনো বই | টি টেবিলে ফুলদানি, খবরের কাগজ

গোরা - 1 | সুচরিতা — 2 | পরেশ - 3

মঞ্চ আলোকিত (শুধু স্পট, দুজনকে ধরে রাখে, একটি স্পট টেবিলের ওপর স্থির থাকে)

গোরা - বিনয় আজ আপনার এখানে এসেছিল?

সুচরিতা - হাঁ।

গোরা - তার পরে বিনয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, কিন্তু আমি জানি কেন সে এসেছিল। আপনারা ব্রাহ্মমতে বিনয়ের বিবাহ দেবার চেষ্টা করছেন। এটা কি ভালো করছেন?

সুচরিতা - ব্রাহ্মমতে বিবাহকে ভালো কাজ বলে মনে করব না এই কি আপনি আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন?

গোরা - আপনার কাছে আমি কোনোরকম ছোটো প্রত্যাশা করি নে, এ আপনি নিশ্চয় জানবেন। কোনো একটা দলকে সংখ্যায় বড়ো করে তোলাই যে-সমস্ত কুলির সর্দারের কাজ আপনি সে শ্রেণীর নন, এ আমি খুব জোর করে বলতে পারি। আপনি কোনো একটি দলের লোকমাত্র নন, এ কথাটা আপনাকে নিজের মনের মধ্যে থেকে নিজে স্পষ্ট বুঝতে হবে।

সুচরিতা - আপনিও কি কোনো দলের লোক নন?

গোরা - আমি হিন্দু। হিন্দু তো কোনে দল নয়। হিন্দু একটা জাতি। এ জাতি এত বৃহৎ যে কিসে এই জাতির জাতিত্ব তা কোনো সংজ্ঞার দ্বারা সীমাবদ্ধ করে বলাই যায় না। সমুদ্র যেমন ঢেউ নয়, হিন্দু তেমনি দল নয়।

সুচরিতা - হিন্দু যদি দল নয় তবে দলাদলি করে কেন? (ছবি ১০)

গোরা - মানুষকে মারতে গেলে সে ঠেকাতে যায় কেন? তার প্রাণ আছে বলে। পাথরই সকল রকম আঘাতে চুপ করে পড়ে থাকে।

সুচরিতা - আমি যাকে ধর্ম বলে জ্ঞান করছি হিন্দু যদি তাকে আঘাত বলে গণ্য করে, তবে সে স্থলে আমাকে আপনি কী করতে বলেন?

গোরা - ইঁদুর যখন জাহাজের খোল কাটতে থাকে তখন ইঁদুরের সুবিধা ও প্রবৃত্তির হিসাব থেকেই সে কাজ করে, দেখে না এতবড়ো একটা আশ্রয়ে ছিদ্র করলে তার যেটুকু সুবিধা তার চেয়ে সকলের কতবড়ো ক্ষতি। আপনাকেও তেমনি ভেবে দেখতে হবে আপনি কি কেবল আপনার দলটির কথা ভাবছেন, না সমস্ত মানুষের কথা ভাবছেন? (ছবি ১১)

আমার কথাগুলো আপনার কাছে হয়তো কঠোর শোনাচ্ছে, কিন্তু আমাকে একটা বিরুদ্ধপক্ষের মানুষ বলে মনে কোনো বিদ্রোহ রাখবেন না। আমি যদি আপনাকে বিরুদ্ধপক্ষ বলে মনে করতুম তা হলে কোনো কথাই বলতুম না। আপনার মনে যে একটি স্বাভাবিক উদার শক্তি আছে সেটা দলের মধ্যে সংকুচিত হচ্ছে বলে আমি কষ্ট বোধ করছি।(ছবি ১২)

সুচরিতা - না না, আমার কথা আপনি কিছু ভাববেন না। আপনি বলে যান, আমি বোঝবার চেষ্টা করছি।

গোরা - আমার আর-কিছুই বলবার নেই— ভারতবর্ষকে আপনি আপনার সহজ বুদ্ধি সহজ হৃদয় দিয়ে দেখুন, একে আপনি ভালোবাসুন। (ছবি ১৩) ভারতবর্ষের লোক — নানারকম করে ভাবে, নানারকম করে চলে, এদের বিশ্বাস এদের সংস্কার নানারকম; কিন্তু সমস্তেরই ভিত্তিতে একটি মনুষ্যত্ব আছে; সমস্তেরই ভিতরে এমন একটি জিনিস আছে যা আমার জিনিস, যা আমার এই ভারতবর্ষের জিনিস; যার প্রতি ঠিক সত্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা-অসম্পূর্ণতার আবরণ ভেদ করে একটি আশ্চর্য মহৎসত্তা চোখের উপরে পড়ে—

সুচরিতা - আপনি আমাকে কী করতে বলেন?(ছবি ১৪)

গোরা - আর-কিছু বলি নে— আমি কেবল বলি আপনাকে এই কথাটা বুঝে দেখতে হবে যে হিন্দুধর্ম মায়ের মতো নানা ভাবের নানা মতের লোককে কোল দেবার চেষ্টা করেছে; অর্থাৎ কেবল হিন্দুধর্মই জগতে মানুষকে মানুষ বলেই স্বীকার করেছে, দলের লোক বলে গণ্য করে নি।

মঞ্চ অন্ধকার (ছবি ১৫)

সঙ্গীত — 1

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ-মাঝে জাগ্রত যে ভালো,
সেই তো তোমার ভালো।

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি।

মঞ্চ আলোকিত

(ছবি ১৬) (সুচরিতা যখন চোখের জল লুকাইবার জন্য তোরঙ্গের 'পরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কাপড় সাজাইতে ব্যস্ত ছিল এমন সময় খবর আসিল, গৌরমোহনবাবু আসিয়াছেন। সুচরিতা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া তাহার কাজ ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। এবং তখনই গোরা ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। গোরা আসিয়াই একেবারে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া পরেশকে প্রণাম করিল এবং তাঁহার পায়ের ধুলা লইল।)

পরেশ - এসো, এসো বাবা, বোসো।

গোরা - পরেশবাবু, আমার কোনো বন্ধন নেই।

পরেশ - কিসের বন্ধন?

গোরা - আমি হিন্দু নই।

পরেশ - হিন্দু নও!

গোরা - না, আমি হিন্দু নই। আজ খবর পেয়েছি আমি মিউটিনির সময়কার কুড়োনো ছেলে, আমার বাপ আইরিশ্‌ম্যান। ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত দেবমন্দিরের দ্বার আজ আমার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে, আজ সমস্ত দেশের মধ্যে কোনো পঙ্‌ক্তিতে কোনো জায়গায় আমার আহারের আসন নেই।

(পরেশ ও সুচরিতা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরেশ তাহাকে কী বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।)

আমি আজ মুক্ত পরেশবাবু!

আমার মনের ভিতরে খুব একটা শূন্যতা ছিল। এই শূন্যতাকে নানা উপায়ে কেবলই অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছি— এই শূন্যতার উপরে নানাপ্রকার কারুকার্য দিয়ে তাকেই আরো বিশেষরূপ সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করেছি! কেননা, ভারতবর্ষকে আমি যে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি— আজ সেই-সমস্ত কারুকার্য বানাবার বৃথা চেষ্টা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমি বেঁচে গেছি পরেশবাবু!

পরেশ - সত্যকে যখন পাই তখন সে তার সমস্ত অভাব-অপূর্ণতা নিয়েও আমাদের আত্মাকে তৃপ্ত করে— তাকে মিথ্যা উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে তোলবার ইচ্ছা মাত্রই হয় না।

গোরা - দেখুন পরেশবাবু, কাল রাত্রে আমি বিধাতার কাছে প্রার্থনা করেছিলুম যে আজ প্রাতঃকালে আমি যেন নূতন জীবন লাভ করি। পরেশবাবু, আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি— মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে এতদিন পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।"

পরেশ - গৌর, তোমার মাতৃক্রোড়ে তুমি যে অধিকার পেয়েছ সেই অধিকারের মধ্যে তুমি আমাদেরও আহ্বান করে নিয়ে যাও।

গোরা - আজ মুক্তিলাভ করে প্রথমেই আপনার কাছে কেন এসেছি জানেন?

পরেশ - কেন? (ছবি ১৭)

গোরা - আপনার কাছেই এই মুক্তির মন্ত্র আছে— আমাকে আপনার শিষ্য করুন। আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই— যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে, কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না— যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।

সুচরিতা, আমি আর তোমার গুরু নই। আমি তোমার কাছে এই বলে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আমার হাত ধরে তোমার ঐ গুরুর কাছে আমাকে নিয়ে যাও। (এই বলিয়া গোরা তাহার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। সুচরিতা চৌকি হইতে উঠিয়া গিয়া নিজের হস্ত তাহার হাতে স্থাপন করিল। তখন গোরা সুচরিতাকে লইয়া পরেশকে প্রণাম করিল।)

মঞ্চ অন্ধকার (ছবি ১৮)

সঙ্গীত — 1

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও ॥
নয়কো বনে, নয় বিজনে, নয়কো আমার আপন মনে—
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, সেথায় আপন আমারও ॥
সবার পানে যেথায় বাহু পসারো
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারও।
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে—
সবার তুমি আনন্দধন হে প্রিয়, আনন্দ সেই আমারও ॥

সঞ্চালক - স্বদেশ (ছবি ১৯)(দু দিকের সামনের কোনে সঞ্চালক এবং সেতারের ওপর আলো)

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় চল্লিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ ছেড়ে বোলপুরে চলে এলেন। পত্তন হল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়। প্রথম থেকেই একের পর এক বিপদ এসে তাঁর উপর আছড়ে পড়েছিল। পত্নী ও দুই পুত্রকন্যার মৃত্যু, অর্থাভাব, লোকনিন্দা, বন্ধুবিয়োগ একের পর এক আঘাতে তিনি তখন বিপর্যস্ত, ঠিক সেই সময় ঘটল লড কার্জনের বঙ্গবিভাগ। ব্যক্তিগত জীবনের ঘনান্ধাকার থেকে মুক্তি পেতেই হোক, বা সদ্য ফেলে আসা বাংলার পল্লীজীবনের স্মৃতিকাতরতাই হোক, সব কিছু মিলে মিশে তাঁকে ঠেলে দিল বঙ্গভঙ্গবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে। এ ধরনের গন আন্দোলনে সামিল তিনি পূর্বে বা পরে কোনোদিনই আর হন নি।

(ছবি ২০) শোভাযাত্রা করে বিশাল দল বেরোল কলকাতার রাজপথে। সবাইকে রাখি পরাতে পরাতে তারা এগিয়ে গেল।

মঞ্চ আলোকিত (নাচের আলো, হলুদ)

সঙ্গীত — সমবেত | সমবেত নৃত্য

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান ॥
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান ॥

মঞ্চ অন্ধকার (দু দিকের সামনের কোনে সঞ্চালক এবং সেতারের ওপর আলো)

সঞ্চালক - কিন্তু অচিরকালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের জগৎ থেকে আবার তাঁর নিভৃত সাধনার জগতে ফিরে এলেন। কারণ তিনি দেখলেন এই আন্দোলন এবং সমকালীন অসহযোগ আন্দোলনে ভাবাবেগ যতখানি আছে দেশের জন্য প্রকৃত কাজ ততখানি নেই। উপরন্ত দেশের নাম করে রয়েছে দুর্বলের ওপর প্রবলের অত্যাচার।

(ছবি ২১) ঘরে বাইরে উপন্যাসে জমিদার নিখিলেশ এর কাছে এসেছে একদল যুবক যারা শিক্ষিত, শহরবাসী ও মোটামুটি সচ্ছল।

মঞ্চ আলোকিত (পুরো আলো, স্পট অভিনেতাদের ওপর)

নিখিলেশ — 4 | মাষ্টারমশায় — 5 | ছেলে - 6

নিখিলেশ - এমন দেখছি স্বদেশীর ধনি খুব প্রবল।

মাষ্টারমশায় — আমাদের এবং আশেপাশের গ্রাম থেকে যে সব ছেলে কলকাতার স্কুলে কলেজে পড়ত তারা ছুটির সময় বাড়ি ফিরে এল, তাদের অনেকে স্কুল কলেজ ছেড়ে দিয়েছে।

নিখিলেশ — হ্যাঁ, তারা সবাই এখন সন্দীপকে দলপতি করে স্বদেশী প্রচারে মেতে উঠেছে। ওই তারা এল দল বেঁধে …

সঙ্গীত — সমবেত

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন—
বন্দে মাতরম্ ॥
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়—
বন্দে মাতরম্ ॥

ছেলে - আমাদের শুকসায়রের হাট থেকে বিলিতি সুতো ব্যাপার প্রভৃতি একেবারে উঠিয়ে দিতে হবে।

নিখিলেশ - সে আমি পারব না।

ছেলে - কেন, আপনার লোকসান হবে?

নিখিলেশ - আমার লোকসান নয়, গরিবের…

মাষ্টারমশায় - হাঁ ওর লোকসান বইকি; সে লোকসান তো তোমাদের নয়।

ছেলে — দেশের জন্যে-

মাষ্টারমশাই - দেশ বলতে মাটি তো নয়, এইসমস্ত মানুষই তো।

তা, তোমরা কোনোদিন চোখের কোনে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? আর আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা কী নুন খাবে, আর কী কাপড় পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছ। ওরা সইবে কেন?

ছেলে - আমরা নিজেরাও তো দিশি চিনি, দিশি নুন, দিশি কাপড় ধরেছি।

মাষ্টারমশায় — তোমাদের মনে রাগ হয়েছে, জেদ হয়েছে, সেই নেশায় তোমরা যা করছ খুশি হয়ে করছ। তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দু পয়সা বেশি দিয়ে জিনিস কিনছ। তোমাদের সেই খুশিতে তো ওরা বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু তোমরা ওদের যা করাতে চাইছ সেটা কেবল জোরের উপরে।...ওদের কাছে দুটো পয়সার দাম কত সে তোমরা কল্পনাও করতে পার না। ওদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা কোথায়। জীবনের মহলে বারবার তোমরা এক কোঠায় আর ওরা এক কোঠায় কাটিয়ে এসেছ। আর আজ তোমাদের দায় ওদের কাঁধের ওপর চাপাতে চাও।

(ছবি ২২) (তারা প্রায় সকলেই মাস্টারমশায়ের ছাত্র, স্পষ্ট কোনো কথা বলতে পারল না। কিন্তু রাগে তাদের রক্ত গরম হয়ে ফুটতে লাগল।)

ছেলে - দেখুন, সমস্ত দেশ আজ যে ব্রত গ্রহণ করেছে কেবল আপনি তাতে বাধা দেবেন?

নিখিলেশ - আমি বাধা দিতে পারি এমন সাধ্য আমার কী আছে। আমি বরং প্রাণপণে তার আনুকূল্য করব।

ছেলে - কী আনুকূল্যটা করছেন?(ছবি ২৩)

নিখিলেশ - দিশি মিল থেকে দিশি সুতো, দিশি কাপড় আনিয়ে আমাদের হাটে রাখিয়েছি। এমন কি, অন্য এলাকার হাটেও আমাদের সুতো পাঠাই।

ছেলে - কিন্তু আমরা আপনার হাটে গিয়ে দেখে এসেছি আপনারা দিশি সুতো কেউ কিনছে না।

নিখিলেশ - সে আমার দোষ নয়, আমার হাটের দোষ নয়। তার একমাত্র কারণ সমস্ত দেশ তোমাদের ব্রত নেয় নি।(ছবি ২৪)

মাষ্টারমশায় - শুধু তাই নয়, যারা ব্রত নিয়েছে তারা বিব্রত করবারই ব্রত নিয়েছে। তোমরা চাও, যারা ব্রত নেয় নি তারাই এই সুতো কিনে, যারা ব্রত নেয় নি এমন লোককে দিয়ে কাপড় কেনাবে, কী উপায়ে? না, তোমাদের গায়ের জোর, আর জমিদারের পেয়াদার তাড়ায়। অর্থাৎ ব্রত তোমাদের, কিন্তু উপবাস করবে ওরা।

মঞ্চ অন্ধকার (ছবি ২৫)

সঙ্গীত — 2

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমনি শক্তিমান !
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান—
তোমাদের এমনি অভিমান ॥
চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নীচে—
এত বল নাই রে তোমার, সবে না সেই টান ॥
শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও,
হওনা- যতই বড়ো আছেন ভগবান ।
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,
বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান ॥

(ছবি ২৬) মঞ্চ আলোকিত (সামনের অংশে আলো, স্পট অভিনেতাদের ওপর)

নিখিলেশ — 4 | বিমলা — 7 | সন্দীপ - 8

মঞ্চে ২টি পুরোনো হাতল ওয়ালা চেয়ার, মাঝখানে, একটা তক্তোপোস সাদা চাদরে ঢাকা | বিমলার হাতে কুরুস সেলাইএর কাপড় |

সন্দীপ - 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র সম্বন্ধে তোমার মত কী? দেশের কাজে মানুষের কল্পনাবৃত্তির যে একটা জায়গা আছে সেটা কি তুমি মান না নিখিল?

নিখিলেশ - একটা জায়গা আছে মানি, কিন্তু সব জায়গাই তার তা মানি নে। দেশ-জিনিসকে আমি খুব সত্যরূপে নিজের মনে জানতে চাই এবং সকল লোককে জানাতে চাই— এতবড়ো জিনিসের সম্বন্ধে কোনো মন-ভোলাবার জাদুমন্ত্র ব্যবহার করতে আমি ভয়ও পাই লজ্জাও বোধ করি।

সন্দীপ - তুমি যাকে মায়ামন্ত্র বলছ আমি তাকেই বলি সত্য। আমি দেশকে সত্যই দেবতা বলে মানি। আমি নরনারায়ণের উপাসক— মানুষের মধ্যেই ভগবানের সত্যকার প্রকাশ, তেমনি দেশের মধ্যে।

নিখিলেশ - এ কথা যদি সত্যই বিশ্বাস কর তবে তোমার পক্ষে এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সুতরাং এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভেদ নেই।

সন্দীপ - সে কথা সত্য, কিন্তু আমার শক্তি অল্প, অতএব নিজের দেশের পূজার দ্বারাই আমি দেশনারায়ণের পূজা করি।

নিখিলেশ - পূজা করতে নিষেধ করি নে, কিন্তু অন্য দেশে যে নারায়ণ আছেন তাঁর প্রতি বিদ্বেষ করে সে পূজা কেমন করে সমাধা হবে? (ছবি ২৭)

সন্দীপ - বিদ্বেষও পূজার অঙ্গ। কিরাতবেশী মহাদেবের সঙ্গে লড়াই করেই অর্জুন বরলাভ করেছিলেন। আমরা এক দিক দিয়ে ভগবানকে মারব, একদিন তাতেই তিনি প্রসন্ন হবেন।

নিখিলেশ - তাই যদি হয় তবে যারা দেশের ক্ষতি করছে আর যারা দেশের সেবা করছে উভয়েই তাঁর উপাসনা করছে ; তা হলে বিশেষ করে দেশভক্তি প্রচার করবার দরকার নেই। (ছবি ২৮)

সন্দীপ - নিজের দেশ সম্বন্ধে আলাদা কথা ; ওখানে যে হৃদয়ের মধ্যে পূজার স্পষ্ট উপদেশ আছে।

নিখিলেশ - তা হলে শুধু নিজের দেশ কেন, তার চেয়ে আরো ঢের স্পষ্ট উপদেশ আছে নিজেরই সম্বন্ধে। নিজের মধ্যে যে নরনারায়ণ আছেন তাঁর পূজার মন্ত্রটাই যে দেশ-বিদেশে সব চেয়ে বড়ো করে কানে বাজছে। (ছবি ২৯)

সন্দীপ - নিখিল, তুমি যে এই-সব তর্ক করছ এ কেবল বুদ্ধির শুকনো তর্ক। হৃদয় ব'লে একটা পদার্থ আছে তাকে কি একেবারে মানবে না? (ছবি ৩০)

নিখিলেশ - আমি তোমাকে সত্য বলছি সন্দীপ, দেশকে দেবতা বলিয়ে যখন তোমরা অন্যায়কে কর্তব্য, অধর্মকে পুণ্য ব'লে চালাতে চাও তখন আমার হৃদয়ে লাগে বলেই আমি স্থির থাকতে পারি নে। আমি যদি নিজের স্বার্থসাধনের জন্যে চুরি করি তা হলে নিজের প্রতি আমার যে সত্য প্রেম তারই কি মূলে ঘা দিই নে? (ছবি ৩১)

বিমলা - ইংরেজ ফরাসী জর্মান রুশ এমন কোন্ সভ্যদেশ আছে যার ইতিহাস নিজের দেশের জন্যে চুরির ইতিহাস নয়?

নিখিলেশ - সে চুরির জবাবদিহি তাদের করতে হবে, এখনো করতে হচ্ছে। ইতিহাস এখনো শেষ হয়ে যায় নি।

সন্দীপ - বেশ তো আমরাও তাই করব। চোরাই মালে আগে ঘরটা বোঝাই করে তার পরে ধীরে সুস্থে দীর্ঘকাল ধরে আমারও জবাবদিহি করব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে বললে এখনো তারা জবাবদিহি করছে সেটা কোথায়? (ছবি ৩২)

নিখিলেশ - রোম যখন নিজের পাপের জবাবদিহি করছিল তখন তা কেউ দেখতে পায় নি। তখন তার ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। বড়ো বড়ো ডাকাত-সভ্যতারও জবাবদিহির দিন কখন আসে তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু একটা জিনিস কি দেখতে পাচ্ছ না— ওদের পলিটিক্সের ঝুলি-ভরা মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তচরবৃত্তি, প্রেস্টিজ্ রক্ষার লোভে ন্যায় ও সত্যকে বলিদান, এই যে-সব পাপের বোঝা নিয়ে চলেছে এর ভার কি কম? আর, এ কি প্রতিদিন ওদের সভ্যতার বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে না? দেশের উপরেও যারা ধর্মকে মানছে না, আমি বলছি, তারা দেশকেও মানছে না। (ছবি ৩৩)

সন্দীপ - আপনি কী বলেন?

বিমলা - আমি বেশি সূক্ষ্মে যেতে চাই নে, আমি মোটা কথাই বলব। আমি মানুষ, আমার লোভ আছে, আমি দেশের জন্যে লোভ করব ; আমি কিছু চাই যা আমি কাড়ব-কুড়ব। আমার রাগ আছে, আমি দেশের জন্যে রাগ করব ; আমি কাউকে চাই যাকে কাটব-কুটব, যার উপরে আমি আমার এতদিনের অপমানের শোধ তুলব। আমার মোহ আছে, আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হব ; আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দুর্গা বলব— যার কাছে আমি বলিদানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেব। আমি মানুষ, আমি দেবতা নই। (ছবি ৩৪)

সন্দীপ - হুরা! হুরা! ... বন্দে মাতরং! বন্দে মাতরং!

নিখিলেশ — (মৃদুস্বরে) আমিও দেবতা না, আমি মানুষ, আমি সেইজন্যেই বলছি, আমার যা-কিছু মন্দ কিছুতেই সে আমি আমার দেশকে দেব না, দেব না, দেব না।

সন্দীপ - দেখো নিখিল, সত্য-জিনিসটা মেয়েদের মধ্যে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে এক হয়ে আছে। আমাদের সত্যে রঙ নেই, রস নেই, প্রাণ নেই, শুধু কেবল যুক্তি। মেয়েদের হৃদয় রক্তশতদল, আমাদের তর্কের মতো তা বস্তুহীন নয়। (ছবি ৩৫)

(এই বলে তিনি মেজের উপর দু-বার জোরে লাথি মারলেন— কার্পেট থেকে অনেকখানি নিদ্রিত ধুলো চমকে উপরে উঠে পড়ল।)

যে আগুন ঘরকে পোড়ায়, যে আগুন বাহিরকে জ্বালায়, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি সেই আগুনের সুন্দরী দেবতা, তুমি আজ আমাদের সকলকে নষ্ট হবার দুর্জয় তেজ দাও, আমাদের অন্যায়কে সুন্দর করো।

(ছবি ৩৬)

মঞ্চ অন্ধকার

সঙ্গীত — 2,3

আপন হতে বাহির হয়ে
বাইরে দাঁড়া ,
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের
পাবি সাড়া ।

এই - যে বিপুল ঢেউ লেগেছে
তোর মাঝেতে উঠুক নেচে ,
সকল পরান দিক - না নাড়া—
বাইরে দাঁড়া , বাইরে দাঁড়া ।

(ছবি ৩৭) (দু দিকের সামনের কোনে সঞ্চালক এবং সেতারের ওপর আলো)

সঞ্চালক - বহুবিধ ঝড়ঝঞ্জা অতীক্রম করে রবীন্দ্রনাথ জীবনের পঞ্চাশ বছর পার করলেন। তাঁর বিধ্বস্ত দেহমন তখন একটা বড় পরিবর্তন চাইছিল। আর সেই সঙ্গে স্বচক্ষে দেখে আসতে চাইছিলেন ইউরোপীয় সভ্যতার ধাত্রীভূমিকে। কী সে গুন যার জোরে ইউরোপ আজ জগৎ জয় করেছে। অবশেষে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ ইংলন্ডগামী জাহাজে উঠলেন। সঙ্গে রইল তাঁর সমসাময়িক কিছু বাছাই করা কবিতার স্বকৃত ইংরাজি অনুবাদ।

(ছবি ৩৮) সে যাত্রায় ইংলন্ড ও আমেরিকা মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায় দেড় বছরের মত বিদেশে ছিলেন। পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। তাঁর কবিতায় তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ফিরে আসার কিছু দিন পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি সংবাদ শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছায়। তার পর দেশ দেশান্তর থেকে তাঁর অবিরত আমন্ত্রন আসতে থাকে, এবং বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা তাঁকে পৃথিবীজুড়ে নিয়ত ভ্রাম্যমান অবস্থায় দেখি।

(ছবি ৩৯) এরই মাঝে, প্রথম মাহাযুদ্ধ পার হল। এই যুদ্ধে ইউরোপীয় সভ্যতার একটা নূতন চেহারা তিনি দেখতে পেলেন। তাদের ততদিনের স্বদেশপ্রেম এখন নিজের সীমা অতিক্রম করে পরজাতিবিদ্বেষের চেহারা নিয়েছে। জাতিপ্রেম আঘাত করছে মানবধর্মকে।

মঞ্চ আলোকিত (নাচের আলো, হলুদ)

কবিতা — সঞ্চালক | নৃত্য

দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন , ওরে দীন ,
ওরে উদাসীন—
ওই ক্রন্দনের কলরোল ,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল ।
বহ্নিবন্যা-তরঙ্গের বেগ ,
বিষশ্বাস-ঝটিকার মেঘ ,
ভূতল গগন
মূর্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গান ;
ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি ,
ডাকিছে কাণ্ডারী
এসেছে আদেশ—

(ছবি ৪০) মৃত্য ভেদ করি
দুলিয়া চলেছে তরী ।
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে , কবে হবে পার ,
সময় তো নাই শুধাবার ।
এই শুধু জানিয়াছে সার
তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী ।
টানিয়া রাখিতে হবে পাল ,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল ;
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী ।
এসেছে আদেশ—

ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি। মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ , প্রবলের উদ্ধত অন্যায় ,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ ,
জাতি-অভিমান ,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান ,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া ।
ভাঙিয়া পড়ুক ঝড় , জাগুক তুফান ,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ ।
রাখো নিন্দাবাণী , রাখো আপন সাধুত্ব-অভিমান ,
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে ।

(ছবি ৪১) মঞ্চ অন্ধকার (দু দিকের সামনের কোনে সঞ্চালক এবং সেতারের ওপর আলো)

সঞ্চালক - প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রেশ রেখে দিয়ে। কিন্তু পরিস্থিতি উত্তরোত্তর জটিলতর হতে থাকল। "সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজ পত্তন হইয়াছে। বানিজ্য এখন আর নিছক বানিজ্য নহে। সাম্রাজ্যের সঙ্গে এখন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে।....এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর কখনো ছিলনা। ...য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।"

(ছবি ৪২) মঞ্চ অন্ধকার

সঙ্গীত — 1 | নৃত্য (নাচের আলো, নীল)

প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন—
দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনিতর্জন ॥
ঘন ঘন দামিনী-ভুজঙ্গ-ক্ষত যামিনী,
অম্বর করিছে অন্ধনয়নে অশ্রু-বরিষন ॥
ছাড়ো রে শঙ্কা, জাগো ভীরু অলস,
আনন্দে জাগাও অন্তরে শকতি।
অকুন্ঠ আঁখি মেলে হেরো প্রশান্ত বিরাজিত
মহাভয়-মহাসনে অপরূপ মৃত্যুঞ্জয়রূপে ভয়হরণ ॥

(ছবি ৪৩) মঞ্চ অন্ধকার (দু দিকের সামনের কোনে সঞ্চালক এবং সেতারের ওপর আলো)

সঞ্চালক - আসি মুক্তধারা নাটকে। উত্তরকূট ও শিবতরাই পাশাপাশি রাজ্য। শক্তিশালী উত্তরকূট শিবতরাই শাসন করবার জন্য তার বানিজ্যপথ বন্ধ করেছিল। তার ওপর এখন দুই দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী মুক্তধারাকে বাঁধ দিয়ে বন্ধ করেছে তাদের জব্দ করবার জন্য।... উত্তরকূটের মানবদরদী যুবরাজ অভিজিৎ যন্ত্ররাজ বিভূতির কাছে দূর পাঠিয়েছেন জলধারাকে মুক্ত করে দেবার জন্য

(ছবি ৪৪) মঞ্চ আলোকিত (স্পট অভিনেতাদের ওপর, একটি স্পট রাবনের ওপর)

মাঝে সিংহাসন, পেছনে যন্ত্র রাবন

দূত — 8 | বিভূতি — 9

দূত। যত্ররাজ বিভূতি, যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন

বিভূতি। কী তাঁর আদেশ?

দূত। এতকাল ধরে তুমি আমাদের মুক্তধারার ঝরনাকে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে লেগেছ। বারবার ভেঙে গেল। কত লোক ধুলোবালি চাপা পড়ল, কত লোক বন্যায় ভেসে গেল। আজ শেষে-

বি। তাদের প্রান দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়েছে।

দূ। শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনও এ খবর জানে না। তারা বিশ্বাস করতএই পারে না যে, দেবতা তাদের জল দিয়েছেন, কোনো মানুষ তা বন্ধ করতে পারে।

বি। দেবতা তাদের কবল জলই দিয়েছেন। আমাকে দিয়েছেন জলকে বাঁধবার শক্তি।

দূ। তারা নিশ্চিন্ত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাদের চাষের খেত-

বি। চাষের খেতের কথা কী বলছ?

দূ। সেই খেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না?

বি। বালি, পাথর জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন চাষির কোন ভুট্টার খেত মারা যাবে। সে কথা ভাববার সময় ছিল না।

দূ। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করছেন এখনো কি ভাববার সময় হয় নি।

বি। না, আমি যন্ত্রশক্তির মহিসার কথা ভাবছি।

দূ। ক্ষুধিতের কান্না তোমার সে ভাবনা ভাঙতে পারবে না?

বি। না, জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কান্নার জোরে আবার যন্ত্র টলে না।

দূ। অভিশাপের ভয় নেই তোমায়?

বি। অভিশাপ। দেখো, উত্তরকূট যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন, রাজার আদেশে, চন্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের ওপর বয়সের ছেলেদের আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা তো অনেকেই ফেরে নি। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েছে। আবশক্তির সঙ্গে যার লড়াই মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে না।

দূ। যুবরাজ বলছেন, কীর্তি গড়ে তোলবার গৌরব তো লাভ হয়েছেই, এখন কীর্তি নিজে ভাঙবার যে আরও বড়ো গৌরব তাই লাভ করো।

বি। কীর্তি যখন গড়া শেষ হয় নি, তখন সে আমার ছিল। এখন সে উত্তরকূটের সকলের। ভঙবার আধিকার আর আমার নেই।

দূ। যুবরাজ বলছেন ভাঙবার আধিকার তিনিই গ্রহণ করবেন।

বি। স্বয়ং উত্তরকূটের যুবরাজ তখন কথা বলেন? তিনি কি আমাদের নন? তিনি কি শিবতরাইয়ের?

দূ। তিনি বলেন, উত্তরকূটে কেবল যন্ত্রের রাজত্ব নয়, সেখানে দেবতাও আছেন, এই কথা প্রমাণ করা চাই।

বি। যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব এই কথা প্রমাণ করবার ভার আমার ওপর। যুবরাজকে বোলো, আমার এই বাঁধযন্ত্রের মুঠো একটুও আলগা করতে পারা যায় এমন পথ খোলা রাখি নি।

দূ। ভাঙনের যিনি দেবতা, তিনি সবসময় বড়ো পথ দিয়ে চলাচল করেন না তাঁর জন্যে যে সব ছিদ্রপথ থাকে তা কারও চোখে পড়ে না।

বি। (চমকিয়া) ছিদ্র। সে আবার কী? ছিদ্রের কথা তুমি কী জান?

দৃ। আমি কী জানি। যাঁর জানবার তিনি জেনে নেবেন।”

(ছবি ৪৫) সঙ্গীত — 3

আমাকে যে বাঁধবে ধরে, এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে।
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,
সে কি অমনি হবে॥
আমাকে যে দুঃখ দিয়ে আনবে আপন বশে,
সে কি অমনি হবে।
তার আগে তার পাষাণ-হিয়া গলবে করুণ রসে,
সে কি অমনি হবে।
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন,
সে কি অমনি হবে॥

(ছবি ৪৬) - সেতার

(ছবি ৪৭) কবিতা — সঞ্চালক | নৃত্য (নাচের আলো, হলুদ)

দুঃখেরে দেখেছি নিত্য , পাপেরে দেখেছি নানা ছলে ;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে ;
মৃত্যু করে লুকাচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি ।
ভেসে যায় তারা সরে যায়
জীবনেরে করে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ ।
আজ দেখো তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ ।
তার পরে দাঁড়াও সম্মুখে ,
বলো অকম্পিত বুকে—
“ তোরে নাহি করি ভয় ,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয় ।
তোর চেয়ে আমি সত্য , এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব , দেখ্ ।
শান্তি সত্য , শিব সত্য , সত্য সেই চিরন্তন এক ।”

(ছবি ৪৮) মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে ,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ - সাথে যুঝে ,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ-লজ্জায় ,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায় ,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাস-রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো ।

(ছবি ৪৯) বীরের এ রক্তস্রোত , মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা ।
স্বর্গ কি হবে না কেনা ।
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ।
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

(ছবি ৫০) মঞ্চ অন্ধকার (দু দিকের সামনের কোনে সঞ্চালক এবং সেতারের ওপর আলো)

সঞ্চালক - রাষ্ট্রশক্তি ও বণিকের স্বার্থ দুটি শক্তি একত্রিত হয়ে গ্রাস করে নিল আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার একটা বড় অংশকে। বিজ্ঞান যেখানে মানবকল্যানে ব্যবহার করা হয় সেখানে তার মুক্তি। সংকীর্ণ স্বার্থ তাকে যখন দাসের মত নিজের অপকর্মে ব্যবহার করে সেখানে সে বন্দী। রক্তকবরীর রাজা তাই জালের আড়ালে বন্দী। তার নামে দেশ চালায় সর্দারেরা। সারা পৃথিবী জুড়ে এই ব্যবস্থা।

Nationalism বক্তৃতামালা এবং অন্যান্য আরও কিছু ইংরাজি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মতামত পাশ্চাত্য দেশে প্রচারিত হয়েছিল। মনীষীরা তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন কিন্তু যাঁদের স্বার্থহানির আশঙ্কা ছিল তাঁরাই ছিলেন শক্তিমান। আজও সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁরাই প্রচারের কলকাটি নাড়েন। পাশ্চাত্য রবীন্দ্রনাথের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা না হবার এটাই বোধহয় সবচেয়ে বড় কারন।

(ছবি ৫১)

রবীন্দ্রনাথ থেমে থাকেন নি। অস্ত্র হাতে তাঁর যুদ্ধ নয়, কলম নিয়েই তাঁর যুদ্ধ। তাই বরাবর যেটা কর্তব্য মনে করেছেন প্রচার করে গেছেন। আশি বছর পার করে তাঁর শেষ প্রবন্ধ সভ্যতার সংকট তাতে সে কথা আছে। শেষ উপন্যাস চার অধ্যায়েও তা আছে।

সঞ্চালক - আধুনিক সন্ত্রাসভিত্তিক জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত অতীন তার অজ্ঞাতবাসে লুকিয়ে আছে।

(ছবি ৫২) মঞ্চ আলোকিত

মঞ্চে মাঝখানে একটা তক্তোপোস ধুষর চাদরে ঢাকা | ওপরে কিছু বই খাতা, পুরোনো টর্চ |

অতীন — 10 | এলা - 11

সঙ্গীত — 1

যত বার আলো জালাতে চাই
নিভে যায় বারে বারে |
আমার হৃদয়ে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে —

(হঠাৎ ঘরের মধ্যে দ্রুতপদে এসে পড়ল এলা । অতীন লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতেই তার বুকের উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলতে লাগল) —

এলা - অতীন, অতীন, পারলুম না থাকতে।

অতীন - (অতীন ধীরে ধীরে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওর অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল) এলী, কী কাণ্ড করলে তুমি?

এলা - কিছু জানি নে, কী করেছি।

অতীন - এ ঠিকানা কেমন করে জানলে?

এলা - তোমার ঠিকানা তুমি তো জানাও নি।

অতীন - যে তোমাকে জানিয়েছে সে তোমার বন্ধু নয়।

এলা - তাও আমি নিশ্চিত জানি কিন্তু তোমার কোনো পথ না জানতে পারলে শূন্যে শূন্যে মন ঘুরে বেড়ায়, অসহ্য হয়ে ওঠে। শত্রুমিত্র বিচার করবার মতো অবস্থা আমার নয়। কতকাল তোমাকে দেখি নি বলো দেখি?

অতীন - ধন্য তুমি!

এলা - তুমি ধন্য অন্তু! যেমনি আমার বাড়িতে আসা নিষেধ হল অমনি সেটা তো মেনে নিতে পারলে!

অতীন - ওটা আমার স্বাভাবিক স্পর্ধা। ওরা আমাকে বলে সেন্টিমেন্টাল, মনে ঠিক করে রেখেছিল সংকটের সময় প্রমাণ হবে আমি ভিজে মাটিতেই তৈরি। ওরা ভাবতেই পারে না সেন্টিমেন্টেই আমার আমোঘশক্তি।"

এলা - মাস্টারমশায়ও তা জানেন।

অতীন - কিন্তু এলী, আজ তুমি যে কাজ করলে সেটা অবৈধ।

এলা - জানি সে-কথা, তবু ভাঙব নিয়ম, শুধু নিজের হয়ে না, তোমার হয়েও। প্রতিদিন আমার মন বলেছে তুমি ডাকছ আমাকে। সাড়া দিতে পারি নে বলে যে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। বলো, আমি এসেছি বলে খুশি হয়েছ!

অতীন - এত খুশি হয়েছি যে তা প্রমাণ করবার জন্য বিপদ স্বীকার করতে রাজি আছি।

এলা - না না, তোমার কেন হবে বিপদ। যা হয় তা আমার হোক। তাহলে আমি যাই অন্তু।

অতীন - কিছুতেই না। তুমি নিয়ম ভেঙে চলে এসেছ, আমি নিয়ম ভেঙে তোমাকে ধরে রাখব। দুজনে মিলে অপরাধ সমান করে নেওয়া যাক।

এলা - এখানে তোমার মেয়াদ কতদিনের?

অতীন - আন্দাজ করছি চব্বিশ ঘণ্টা। ওই আঙিনায় রসে-বিগলিত নানা রঙের লীলা সমানে চলবে দিনের পর দিন, অতীন্দ্র বিলীন হয়ে যাবে পাণ্ডুবর্ণ দূরদিগন্তে।

এলা - তোমার ভবিষ্যৎ ঠিকানাটা?

অতীন - হুকুম নেই বলবার।

এলা - তাহলে কি কল্পনাও করতে পারব না তুমি আছ কোথায়?

অতীন - কল্পনা করতে দোষ কী। মানস-সরোবরের তীরটা ভালো জায়গা।

(ছবি ৫৩) সঙ্গীত — 1

সমুখে শান্তিপারাবার—
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার ।
তুমি হবে চিরসাথি, লও লও হে ত্রোড় পাতি—
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারকার ।।
মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার ।
হয় যেন মর্তের বন্ধনক্ষয়, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়—
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা-অজানার ।।

(ছবি ৫৪)

(ইতিমধ্যে ঝুলির ভিতর থেকে বইগুলো বের করে এলা উলটেপালটে দেখছে। কাব্য, তার কিছু ইংরেজি, আর দুই-একখানা বাংলা।)

অতীন - এতদিন এগুলো বয়ে বেড়িয়েছি পাছে নিজের জাত ভুলি। ওরই বাণীলোকে ছিল আমার আদি বসতি। পাতা খুললেই পেনসিলে চিহ্নিত তার রাস্তা-গলির নির্দেশ পাবে। আর আজ! এই দেখো চেয়ে।"

এলা — (হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে অতীনের পা জড়িয়ে ধরলে) মাপ করো, অন্তু, আমাকে মাপ করো।

অতীন - তোমাকে মাপ করবার কী আছে এলী? ভগবান যদি থাকেন, তাঁর যদি থাকে অসীম দয়া তবে তিনি যেন আমাকে মাপ করেন।

এলা - যখন তোমাকে চিনতুম না তখন তোমাকে এই রাস্তায় দাঁড় করিয়েছি।

অতীন - সত্যি কথা হল? আমি ছিটকে পড়েছি রাস্তায় অন্তরের বেগে, তুমি উপলক্ষ্যমাত্র। অন্য কোনো শ্রেণীর বঙ্গমহিলাকে উপলক্ষ্য পেলে এতদিনে গোরা-কালা-সম্মিলনী ক্লাবে ব্রিজ খেলতে যেতুম, ঘোড়দৌড়ের মাঠে গবর্নরের বক্সের অভিমুখে স্বর্গারোহণপর্বের সাধনা করতুম।

এলা - অন্তু, দোহাই তোমার, আর বাজে বকুনি বকো না! তোমার জীবিকা আমিই ভাসিয়ে দিয়েছি এ দুঃখ কখনো ভুলতে পারব না। দেখতে পাচ্ছি তোমার জীবনের মূল গেছে ছিন্ন হয়ে।

অতীন - এতক্ষণে সেই মেয়ের প্রকাশ হয়, যে-মেয়েটি রিয়ল্। একটুকুতেই ধরা পড়ে দেশোদ্ধারের রঙ্গমঞ্চে তুমি রোম্যান্টিক। এসে পড় অপ্রকৃতিস্থতার ঝোঁকে, সহজবুদ্ধি নিয়ে নয়।"

এলা - তোমার পায়ে পড়ি আমাকে বুঝিয়ে দাও আমার ভুলে তুমি ভুল কেন করলে? কেন নিলে জীবিকা বর্জনের দুঃখ?

অতীন - ওটা আমার ব্যঞ্জনা, ইংরেজিতে যাকে বলে জেস্চার। ওটা আমার নিদেনকালের ভাষা। যদি দুঃখ না মানতুম তাহলে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে, কিছুতে বুঝতে না তোমাকে কতখানি ভালোবেসেছি। সেই কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলো না ওটা দেশকে ভালোবাসা।

এলা - দেশ এর মধ্যে নেই অন্তু?

অতীন - দেশের সাধনা আর তোমার সাধনা এক হয়েছে বলেই দেশ এর মধ্যে আছে। একদিন বীর্যের জোরে যোগ্যতা দেখিয়ে পেতে হত মেয়েকে। আজ সেই মরণপণের সুযোগ পেয়েছি।

এলা - আমার একটা কথা তোমাকে রাখতেই হবে। আমার আছে পৈতৃক বাড়ি, আরও আছে কিছু জমা টাকা। দোহাই তোমার, বার বার দোহাই দিচ্ছি, কথা রাখো, আমার কাছে টাকা নিতে সংকোচ করো না। জানি তোমার খুবই দরকার।

অতীন - খুবই দরকার পড়লে ম্যাট্রিকুলেশনের নোটবই লেখা থেকে আরম্ভ করে কুলিগিরি পর্যন্ত খোলা রয়েছে।

এলা - আমি মানছি, অন্তু, আমার সমস্ত জমা টাকা দেশের কাজে এতদিনে খরচ করে ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু উপার্জনে আমাদের সুযোগ কম বলেই সঞ্চয়ে আমাদের অন্ধ আসক্তি।

(ছবি ৫৫) (এলা অতীনের কাছে এসে ঘেঁসে বসল, তার মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার উপরে নিজের মাথা হেলিয়ে রাখলে। কখনো কখনো আস্তে আস্তে চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে অতীন মাথা তুলে বসে এলার হাত চেপে ধরলে।)

অতীন - যে-দিন মোকামার খেয়াজাহাজে চড়েছিলুম সেদিন ভাগ্যদেবী অদৃশ্য হাতে কান মলে দিয়ে গেলেন তা বুঝতে পারি নি। সেদিনের কথা তোমার কাছে পুরোনো হয়েছে কি?

এলা - একটুও না।

অতীন - তখন বেলা পড়ে এসেছে, আকাশে যাকে বলে কনে-দেখা মেঘ। গঙ্গার জল লাল আভায় টলটল করছে। ওই ক্ষিপ্রগমন শরীরটি সেই রাঙা আলোর ভূমিকায় চিরদিন আঁকা রয়ে গেল আমার মনে।

কী হল তার পরে? এসে পড়েছি কোথায়? তোমার থেকে কতদূরে! তুমিও কি জান তার সব বিবরণ?

এলা - আমাকে জানতে দাও না কেন অন্তু?

অতীন - বারণ মানতে হয়। শুধু তাই কি? কী হবে সব কথা বলে?—

আমার চোখ দুটো এসেছে ছুটির দরবারে তোমার কাছে। একমাত্র তোমার কাছেই আমার ছুটি। অতি ছোটো তার আয়তন, সোনার জলে রাঙানো ফ্রেমের মতো। এই ছোটো একটি অপরূপ পরিপূর্ণতাকে চারদিকে ভ্রূকুটি করে ঘিরে আছে বড়ো নাম ওআলা বড়ো ছায়া ওআলা বিকৃতি।(ছবি ৫৬)

এলা - কী বলছ, অন্তু!

অতীন - মনে পড়ছে কুলি-বস্‌তিতে আমাকে বাসা নিতে বলেছিলে। তোমার মনের মধ্যে ছিল আমার বংশের অভিমানকে ধূলিসাৎ করবার অভিপ্রায়। তোমার সেই সুমহৎ অধ্যবসায়ে আমার মজা লাগল।

ডিমক্রাটিক্ পিক্‌নিকে নাবা গেল। গাড়োয়ান-পাড়াতে ঘুরলুম। দাদা-খুড়োর সম্পর্ক পাতিয়ে চললুম বহুবিধ মোষের গোয়ালঘরের পাশে পাশে। কিন্তু তাদেরও বুঝতে বাকি ছিল না, আমারও নয় যে এই সম্পর্কের ছাপগুলো ধোপ সইবে না।

নিশ্চয় এমন মহৎ লোক আছেন সব যন্ত্রেই যাঁদের সুর বাজে, এমন-কি, তুলো-ধোনা যন্ত্রেও। আমরা নকল করতে গেলে সুর মেলে না। দেখো নি তোমাদের পাড়ার খ্রীস্টশিষ্যকে, ব্রাদার বলে যাকে-তাকে বুকে চেপে ধরা তার অনুষ্ঠানের অঙ্গ। এতে খ্রীস্টকে ব্যঙ্গ করা হয়।

এলা - কী হয়েছে তোমার অন্তু! কোন্ ক্ষোভের মুখে এ-সব কথা বলছ? তুমি কি বলতে চাও কর্তব্যকে কর্তব্য বলে মানা যায় না অরুচি কাটিয়ে দিয়েও?

অতীন - রুচির কথা হচ্ছে না এলী, স্বভাবের কথা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বীরের কর্তব্যই করতে বলেছিলেন অত্যন্ত অরুচি সত্ত্বেও; কুরুক্ষেত্র চাষ করবার উদ্দেশে এগ্রিকাল্‌চারাল ইকনমিক্‌স চর্চা করতে বলেন নি।

এলা - শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে হলে কী বলতেন, অন্তু?

অতীন - অনেকদিন আগেই কানে কানে বলে রেখেছেন। নির্বিচারে সবারই একই কর্তব্য, গুরুমশায় কানে ধরে এই কথাটা বলতেই এত কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়েছে।

এলা - দেখো অন্তু, আজও বুঝতে পারি নে যে-পথ তোমার নয়, সে-পথ থেকে কেন তুমি জোর করে ফিরে আস নি?(ছবি ৫৭)

অতীন - তাহলে বলি। অনেক কথা জনাতুম না অনেক কথা ভাবি নি এই পথে প্রবেশ করবার আগে। একে একে এমন সব ছেলেকে কাছে দেখলুম, বয়সে যারা ছোটো না হলে যাদের পায়ের ধুলো নিতুম। তারা চোখের সামনে কী দেখেছে, কী সয়েছে, কী অপমান হয়েছে তাদের, সে-সব দুর্বিষহ কথা কোথাও প্রকাশ হবে না। এরই অসহ্য ব্যথায় আমাকে খেপিয়ে তুলেছিল। বারবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, ভয়ে হার মানব না, পীড়নে হার মানব বা, পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরব তবু তুড়ি মেরে উপেক্ষা করব সেই হৃদয়হীন দেয়ালটাকে।

এলা - তারপরে কি তোমার মত বদলে গেল?

(ছবি ৫৮)

অতীন - শোনো আমার কথা। শক্তিমানের বিরুদ্ধে যে লড়াই করে, সে উপায়বিহীন হলেও সে-ই শক্তিমানের সমকক্ষে দাঁড়ায়; তাতে তার সম্মান রক্ষা হয়। সেই সম্মানের অধিকার আমি কল্পনা করেছিলুম। দিন যতই এগোতে থাকল চোখের সামনে দেখা গেল, —অসাধারণ উচ্চ মনের ছেলে অল্পে অল্পে মানুষ্যত্ব খোয়াতে থাকল। এতবড়ো লোকসান আর কিছুই নেই। নিশ্চিত জানতুম আমার কথা হেসে উড়িয়ে

দেবে, রেগে বিদ্রূপ করবে, তবু ওদের বলেছি অন্যায়ে অন্যায়কারীর সমান হলেও তাতে হার, পরাজয়ের আগে প্রমাণ করে যেতে হবে আমরা ওদের চেয়ে মানবধর্মে বড়ো—নইলে এতবড়ো বলিষ্ঠের সঙ্গে এমনতরো হারের খেলা খেলছি কেন? নির্বুদ্ধিতার আত্মঘাতের জন্যে?—আমার কথা ওদের কেউ বোঝে নি তা নয়। কিন্তু কত জনই বা!

এলা - তখনও ওদের ছাড়লে না কেন?(ছবি ৫৯)

অতীন - আর কি ছাড়তে পারি? তখন যে শাস্তির নিষ্ঠুর জাল সম্পূর্ণ জড়িয়ে এসেছে চারদিকে। রাগই করি আর ঘৃণাই করি, তবু বিপন্নদের ত্যাগ করতে পারি নে। মানুষ্যত্বের অপমান করেও কিছুদিনের মতো জয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলতে পারে তারা যাদের আছে বাহুবল, কিন্তু আমরা পারব না। আগাগোড়া কলঙ্কে কালো হয়ে পরাভবের শেষসীমায় অখ্যাতির অন্ধকারে মিশিয়ে যাব আমরা।"

এলা - কিছুকাল থেকে এই ভয়ংকর ট্রাজেডির চেহারা আমার কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অন্তু। গৌরবের আহ্বানে নেমেছিলেম কিন্তু লজ্জা বেড়ে উঠছে প্রতিদিন। এখন আমরা কী করতে পারি বলো আমাকে।(ছবি ৬০)

অতীন - সব মানুষের সামনেই ধর্মক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ আছে। এখানকার কর্মফল এখানেই নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

এলা - সব বুঝতে পারছি, তবু অন্তু আমাদের দেশের কাজ নিয়ে কিছুদিন থেকে এমন কঠিন ধিক্কার দিয়ে তুমি কথা বল, সে আমাকে বড়ো বাজে।

অতীন - তার কারণ কী সে-কথা এখন আর না বললেও হয়, সময় চলে গেছে।

এলা - তবু বলো।(ছবি ৬১)

অতীন - আমি আজ স্বীকার করব তোমার কাছে,—তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সেই পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজ্‌মের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চে না মানে তাদের পেট্রিয়টিজ্‌ম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়া নৌকো। মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

এলা - আচ্ছা অন্তু, তুমি যাকে আত্মঘাত বল সে কি আমাদেরই দেশে?

অতীন - তা বলি নে। দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ংকর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশনালিস্ট আজকাল পাশবগর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে গুমরে উঠছে—এই কথা সত্যভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুরঙ্গোর মতো লুকোচুরি করে দেশ-উদ্ধার চেষ্টার চেয়ে সেটা হত চিরকালের বড়ো কথা।

কিন্তু এ-জন্মের মতো বলবার সময় হল না। আমার বেদনা তাই আজ এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।

(ছবি ৬২) সঙ্গীত — 1

একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে
এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি,
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি—
ঘাতক সৈন্যে ডাকি
'মারো মারো' ওঠে হাঁকি ।
গর্জনে মিশে পূজামন্ত্রের স্বর—
মানবপুত্র তীব্র ব্যথায় কহেন, হে ঈশ্বর !
এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা
দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও ত্বরা ॥

(ছবি ৬৩)

এলা - ফিরে এস অন্তু।

অতীন - আর ফেরবার পথ নেই।

এলা - কেন নেই?

অতীন - অজায়গায় যদি এসে পড়ি সেখানকারও দায়িত্ব আছে শেষ পর্যন্ত।- উপায় নেই।

এলা - কেন উপায় নেই? নিশ্চয় আছে।

অতীন - তীর লক্ষ্য হারাতে পারে তূণে ফিরতে পারে না।

এলা - অন্তু, নিশ্চয় জেনো, তুমি চলে গেলে একমুহূর্ত আমি বাঁচব না। তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, এ-কথায় আজ যদি বা সন্দেহ কর, একান্ত মনে আশা করি মৃত্যুর পরে সে সন্দেহ সম্পূর্ণ ঘোচাবার একটা কোনো রাস্তা কোথাও আছে।

(হঠাৎ অতীন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তীরের মতো তীক্ষ্ণ হুইস্‌লের শব্দ এল দূর থেকে। চমকে বলে উঠল)

অতীন - চললুম।

এলা - কোথায় যাচ্ছ?

অতীন - কিচ্ছু জানি নে।

(একটুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইল অতীন। দ্বিতীয়বার হুইস্‌লের শব্দ এল। অতীন গর্জন করে বললে, "ছেড়ে দাও।" বলে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল।)

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এলা মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে। তার বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে, তার চোখে জল নেই। এমন সময় গম্ভীর গলায় ডাক শুনতে পেল,

ইন্দ্রনাথ - এলা। এখানে কেন এলে?

চমকে উঠে বসল। দেখলে ইলেকট্রিক টর্চ হাতে ইন্দ্রনাথ। তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বললে,

এলা - বিপদ আছে জেনেই এসেছি।

ইন্দ্রনাথ - (তীব্র ভর্ৎসনার সুরে ইন্দ্রনাথ বললেন) তোমার বিপদের কথা কে ভাবছে? যাও ঘরে ফিরে। ট্যাক্‌সি আছে বাইরে।

মঞ্চ অন্ধকার - (ছবি ৬৪)

সঙ্গীত — সমবেত

ওই মহামানব আসে ।
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে ॥

সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন ।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন ।

মঞ্চ আলোকিত

উদয়শিখরে জাগে 'মাভৈঃ মাভৈঃ'
নবজীবনের আশ্বাসে ।
'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি-উঠিল মহাকাশে ॥